তুলি-কলম

রেখায় লেখায় অবনীন্দ্রনাথ

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

আলোর ফুলকি

সেই যে একরত্তি এক ছেলে, পদ্মদাসীর হাতের চাপড় খেয়ে ঘুমপাড়ানি ছড়ার তালে ঘুমে পড়ত ঢুলে, আর ঘুম থেকে উঠে দেখত ছোট্ট একটা রোদ্দুর ঘরে মাদুর বিছিয়ে বসে আছে, কোনওদিন বা জানালা দিয়ে এসে বসেছে তক্তপোষের কোণে, ফাঁকা বিছানা পেয়ে ভারি মজায় গড়িয়ে নিয়েছে তার বালিশে তোষকে চাদরে, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে দেওয়ালে। পাছে কেউ ধরে ফেলে, বন্দি করে রাখে মুঠিতে, ভয়কাতুরে রোদ্দুর তাই পালিয়ে বেড়ায়, দেওয়াল বেয়ে উঠতে থাকে, ছুঁয়ে ফেলে কড়িকাঠ। কোনওদিন বা সেই একরত্তি ছেলেটির মাথার বালিশেই ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সেই রোদ্দুর, হাত চাপা দিয়ে তাকে ধরতে গেলেই সে পালিয়ে যায় আঙুলের ফাঁক গলে। বালিশ চাপা দিয়ে ধরতে গেলে উঠে এসে বসে বালিশের গায়ে আর চিত হয়ে তার ওপর শুয়ে পড়লে সে পিঠ ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটির নাকের ডগায়। উপুড় হয়ে তাকে চেপে ধরলেই সে ধরা পড়ে যায় চোখে। তারপর থেকে সেই আলো রইল তার চোখে বন্দি হয়ে, চোখ থেকে ছুটে গেল মনে আর মনের মধ্যে গড়ে তুলল এক আলোর জগৎ, স্বপ্নের জগৎ। সে-জগতে সবকিছুই রঙিন—ভাষা, ভাব, ছবি সব রঙে রঙে ভরা। এই রং নিয়েই ছোট্ট ছেলেটির যত খেলা, তার তুলিতে রং, কথায় রং, লেখায় রং, পুতুলে রং। রং ও রেখার তিনি আশ্চর্য কারিগর। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছবি লেখা'র আশ্চর্য জাদুকর—বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন ভাবনার গতিমুখ খুলে দেন, হয়ে ওঠেন শিল্পরচনার অন্যতম অনুপ্রেরণা, কখনও শিশুদের আশ্চর্য কল্পরাজ্যের স্বপ্ন ফেরি করতে বেরিয়ে পড়েন, গল্পকথনের আশ্চর্য মায়ায় জড়িয়ে নেন সকলকে। আবার শিল্পচর্চার রূপতত্ত্ব আর রসতত্ত্ব ব্যাখ্যায় রসময় পাণ্ডিত্যের নিশান উড়িয়ে এগিয়ে চলেন হার-না-মানা গতিতে। তারায় তারায় ঢাকা ঠাকুরবাড়ির ছায়াপথে চিরকালের আপনভোলা এই কিশোর নতুন নতুন সৃষ্টির নেশায় মেতেছিলেন। সে-আশ্চর্য সৃষ্টির আলো পৌঁছেছিল বিশ্ববাসীর মনে, সেই একটুকরো রোদ্দুরের মতো।

পুরাতন কথা

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট, ১২৬৪ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ। সেদিন জন্মাষ্টমী। জোড়াসাঁকো

ঠাকুরবাড়িতে জন্ম নিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বাবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা সৌদামিনী দেবী। প্রিন্স দ্বারকানাথের মেজোছেলে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী যোগমায়া দেবী ৫ নম্বরের আদি বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়িটিতে। এই রাজকীয় বৈঠকখানা বাড়িটি দ্বারকানাথ নির্মাণ করেছিলেন মূলত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য। এই বাড়িতেই বেড়ে ওঠেন গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ। জন্ম হয় তাঁর আরও দুই পুত্র গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র এবং কন্যা বিনয়িনী ও সুনয়নী দেবীর। ঠাকুরবাড়ির প্রথা মেনে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'ই কেটেছিল অবনীন্দ্রনাথের শৈশব। প্রথমে পদ্মদাসী, তারপর রামলাল—এরা দুজনেই দেখভাল করেছিল তাঁকে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে রাতের আঁধারের সঙ্গে মিশে থাকা পদ্মদাসী তাঁর মুখে নাড়ু গুঁজে দিয়ে, পিঠ চাপড়ে চলে যেত আন্দিবুড়ির আসরে। আন্দিবুড়ি আসত দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামাসংগীত শোনাতে তাঁর মায়েদের। গানের গলাটি ছিল ভারি মিঠে। এদের গুজগুজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পৌঁছে যেতেন রঙে ভরা স্বপ্নের জগতে।

তাঁর প্রিয় 'রবিকা' রবীন্দ্রনাথের মতোই, স্কুলের শিক্ষার ধরাবাঁধা পাঠক্রমের প্রচলিত শিক্ষা তাঁর ভাল লাগত না মোটেই। তবু নর্মাল স্কুলে ভর্তি হলেন। পেটব্যথা, মাথা ধরা—নানা ছুতোয় স্কুল কামাই ছিল রোজকার ব্যাপার। সেইসব দিনগুলোর স্মৃতিচারণায় রাণী চন্দকে বলেছিলেন, ''...তখন নর্মাল স্কুলে, পড়াশুনো করি বলব না, যাওয়া-আসা করি... স্কুলের ঐ পাকা দেয়াল-ঘেরা বন্ধ ঘরের ভিতরে দম যেন আটকে আসে আমার। যতক্ষণ পারি ঘরের বাইরেই ঘোরাফেরা করি। স্কুলের পাশে শ্যাম মল্লিকের বাড়ি... তাদের বাড়িতে একটা পোষা ভাল্লুক চরে বেড়ায় সামনের বাগানে, দেখা যায়, ইস্কুল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল্লুক দেখি। ইস্কুল ঘরের বাইরে যা-কিছু সবই আমার কাছে ভালো লাগে।''[১] পাশের উঁচু ক্লাসের দাদাদের 'কেমিয়াবিদ্যা' শেখানো হয়, লাল নীল জল নিয়ে মাস্টারমশাই ঢালাঢালি করেন, লাল জল নীল হয়, নীল জল লাল, মাঝে মাঝে তাও উবে যায়, জানালা দিয়ে সেই রঙের খেলা দেখেন তিনি।

এই নর্মাল স্কুলেই হয় তাঁর ছবি আঁকার হাতেখড়ি ড্রয়িং মাস্টার সাতকড়িবাবুর কাছে। কালো বোর্ডের গায়ে মোটা কাগজে মেটে কুঁজো আর গ্লাসের ছবি এঁকে দেন সাতকড়িবাবু, বলেন, ''দেখে দেখে আঁকো এবারে।'' সহপাঠী, সহযাত্রী বন্ধু ভুলু তাঁকে দেখিয়ে দেন কুঁজো আঁকার ছিরিছাঁদ আর সেই কুঁজো আঁকতে আঁকতেই তাঁর মন একেবারে ''কুঁজোর ভিতরে কুয়োর তলায় ব্যাঙের মতো টুপ করে ডুব দিতে চায়।'' জাহাজ আঁকতে আঁকতে মন চড়ে বসে সেই জাহাজে। মন তাঁর কাপ্তেন হয়ে যেতে চায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

এমনই ছিল কল্পনা আর রঙের নেশায় বিভোর অবনীন্দ্রনাথের শৈশব, যদিও তাঁর এই শৈশব বার্ধক্যের গণ্ডিতেও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। দাদাদের প্রশ্রয়, রবিকার স্নেহলালিত 'অবন' আজীবন নতুন সৃষ্টির তাড়নায় খেয়ালখুশির নিজস্ব জগতে বিচরণ করেছেন। ছবি এঁকেছেন, না এঁকেও থেকেছেন। কুটুম-কাটাম গড়েছেন, পালা লিখেছেন, যাত্রায় মেতে উঠেছেন ছেলেপুলেদের নিয়ে। নতুনের মধ্যে যে-আনন্দ যে-বিস্ময় তাকে হৃদয়ে আগলে রেখেছেন। চিরাচরিতের মধ্যে যে-ক্লান্তি, বিষণ্ণতা তা তাঁকে ছুঁতে পারেনি কোনওদিন। নতুন নতুন দরজা খুলে নতুন বিস্ময় নতুন আনন্দের সন্ধান যে ছিল তাঁর বাল্যের সঙ্গী!

সেই কৌতূহল নিয়েই ছোটপিসিমার ঘরের দরজায় উঁকি দিতেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণের পায়েস খাওয়ার ছবি, শকুন্তলার ছবি, কাদম্বরীর ছবি, মদনভস্মের ছবি আশ্চর্য আকর্ষণ জাগিয়ে তুলত

তাঁর শিশুমনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই বিরাট বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যেই কল্পনার এক রাজ্য গড়েছিলেন ছোট্ট অবনীন্দ্রনাথ। পাঁচ নম্বর বাড়ির একতলার সিঁড়ির নিচে যত বাতিল আসবাব বোঝাই একটা ঘর ছিল। সেটাই তাঁর 'পরীস্থান'। অজানা বিস্ময়ে রহস্যে ঘেরা সেই বন্ধ ঘরের ভেতর ঢোকার চাবি নিয়ে নন্দ ফরাস এলেই আবছা অন্ধকার মাখা সেই ঘরে ঢুকে পড়তেন তিনি। ''কত কালের কতরকমের পুরোনো ঝাড়-লণ্ঠন, রঙবেরঙের চিনেমাটির বাতিদান, ফুলদানি, কাচের ফানুস, আরও কত কী! তারা যেন পুরাকালের পরী—তাকের উপর সারি সারি চুপচাপ, ধুলো গায়ে, ঝুল-মাকড়সার জাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে; কেউ-বা মাথার উপরে কড়ি থেকে ঝুলছে শিকড় ধরে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। কাচমোড়া ঘুলঘুলি থেকে বাইরের একটু হলদে আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় তাদের গায়ে থেকে থেকে চমক দিচ্ছে রামধনুর সাত রঙ। আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই টুং টাং শব্দে ঘর ভরে যায়। মনে হয়, যেন সাতরঙা সাতপরীর পায়ে ঘুঙুর বাজছে।''[২] এই ছবি আর সুর তাঁকে ঘিরে ছিল তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলোতে। সন্ধ্যে হলে মাঝে মাঝে শুনতে পেতেন পাশের বাড়ির তেতলার ছাদ থেকে গান ভেসে আসছে রবিকা-র। নতুন কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাচ্ছেন। পেশাদার গায়ক আর কীর্তনীয়ারাও আসতেন বাড়িতে। ছিলেন ভাড়া করা গাইয়ে কেষ্ট আর বিষ্ণু, তাঁরা আসতেন তাঁর বাবামশাই গুণেন্দ্রনাথের কাছে দুর্গাপুজোয় আগমনী-বিজয়ার গান শোনাতে। মজলিসও বসত তখন সেই বাড়িতে, সেখানে ছোটরা যেত না কিন্তু গানের সুর কানে এসে পৌঁছত। সেইসব সুরের তান আর টান তাঁর মনে অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছিল বলেই নর্মাল স্কুল ত্যাগ করে যদুমাস্টারের কাছে আর সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা শেষের পর গিয়েছিলেন এসরাজ শিক্ষার আসরে। গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে এসরাজ শিখেছিলেন সিমলেপাড়ার কানাইলাল ঢেরীর কাছে। সঙ্গে সুরেন ঠাকুর আর অরুণেন্দ্রনাথ। বেশ কিছুদিনের চেষ্টায় এসরাজ বাজাতে শিখে নিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে শুরু করলেন খামখেয়ালি সভার আসরে। কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না, সৃষ্টির আনন্দ পেলেন না। ''দেখি সেই মামুলি গৎ, সেই মামুলি সুর বাজাতে হবে বারে বারে। একটু এদিক-ওদিক যাবার জো নেই—গেলেই তো মুশকিল। কারণ, ঐ যে বললুম, ভিতরের থেকে শখ আসা চাই। আমার তা ছিল না। নতুন সুর বাজাতে পারতুম না, তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বারবার ধরাবাঁধা একই জিনিসে মন ভরে না। সেই ফাঁকটা নেই যা দিয়ে গলে যেতে পারি, কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে পারি।''[৩]

বরাবর এই সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ খুঁজেছেন অবনীন্দ্রনাথ, সেই আনন্দের মধ্যে খুঁজেছেন সৃষ্টিকে। খুব শৈশবে ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক তেমন ছিল না। বরং ঝোঁক ছিল নতুন কিছু জানার, বন্ধ ঘরের রহস্য ভেদ করবার, সব কিছু খুলে কলকব্জার কারিগরি দেখার। বকুনিও খেয়েছেন তার জন্য, আবার নিজের দস্যিপনার কথা বলে হেসে উঠেছেন সত্তরোর্ধ্ব শৈশবে। ছেলেবেলায় টবের মধ্যে খেলে বেড়ানো লাল মাছগুলো দেখে একদিন তাঁর মনে হল, লালজল না হলে ঠিক মানায় না মাছগুলোকে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। খানিকটা রং এনে গুলে দিলেন। লালজলে লাল মাছগুলো কিলবিল করে উঠল। তারপর যা হওয়ার তাই হল—মাছগুলো মরে ভেসে উঠল। সারা বাড়ি হুলুস্থূল। কার কীর্তি? খোঁজ খোঁজ রব উঠল। রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী দেবীর স্বামী, অবনীন্দ্রনাথের পিসেমশাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, ''এ আর কারো কাজ নয়,

ঠিক ওই বোম্বেটের কাজ।" ব্যাস, সেই থেকে বোম্বেটে নামেই বিখ্যাত হলেন তিনি। ক্যানারি পাখির খাঁচা খুলে পাখি উড়িয়ে দেওয়া, মিস্ত্রিরা হাতুড়ি আর বাটালি রেখে খেতে গেছে দেখে তাদের মতো বাটালি চালাতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে বাটালি চালিয়ে দেওয়া, দাদাদের প্ররোচনায় মাটির গোপাল ঠাকুরের ভেতর কী বিস্ময় আছে দেখতে, তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কান্না জুড়ে দেওয়া—এসবই ছিল সেই বোম্বেটে অবনের বোম্বেটেগিরির নমুনা।

ভারি আনন্দ হত তাঁর কোন্নগরে গেলে। গ্রীষ্মকালে জোড়াসাঁকো ছেড়ে কোন্নগরে বাগানবাড়িতে যেতেন সকলে মিলে। একদিকে গঙ্গা, খোলা প্রকৃতির সান্নিধ্য, বাগান, মাঠ, অনাবিল আনন্দের উপকরণ ভরিয়ে তুলত তাঁকে। এপাশে কোন্নগরের বাগানবাড়ি থেকে বন্দুকের গুলি ছোঁড়েন তাঁর বাবা, অপর পারে পেনেটির বাগান থেকে গুলি ছুঁড়ে তার উত্তর দেন নতুনকাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বন্দুকের আওয়াজে এইভাবে সিগনালে কথা বলেন দুই ভাই। পানসি চড়ে তাঁরা আসেন এইপারে তো কোনওদিন এঁরা যান ওই পারে। বাবা জোর করে ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নামিয়ে দেন চাকরদের দিয়ে গঙ্গায়, কোমরে গামছা বেঁধে চলে সাঁতার শেখানোর প্রয়াস। টাট্টু ঘোড়ায় চেপে তাঁরা ঘুরে বেড়ান, গঙ্গার স্রোতে ভাসমান নৌকোদের দিকে পলকহীন চেয়ে থাকার মধ্যে সৌন্দর্যের উপলব্ধি এক অসামান্য আনন্দে মনকে ভরিয়ে তোলে। প্রজাপতির পায়ে সুতো বেঁধে উড়িয়ে দিয়ে তার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে কখন যে মনটাকেও কল্পরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে যেতেন তা নিজেই জানতেন না। তাঁর নিজের কথাতেই : ''এমনি করে চলত আমার চোখের দেখা সারাদিন ধরে। রাত্রে যখন বিছানায় যেতুম তখনও চলত আমার কল্পনা। নানারকম কল্পনায় ডুবে থাকত আমার মন; স্পষ্ট যেন দেখতে পেতুম সব চোখের সামনে। খড়খড়ির সামনে ছিল কাঁঠালগাছ। জ্যোৎস্না রাত্তির, চাঁদের আলোয় কাঁঠালতলায় ছায়া পড়েছে, ঘন অন্ধকার। দিনের বেলায় চাটুজ্জে মশাই বলেছিলেন, আজ রাত্তিরে কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির বিয়ে হবে। রাত জেগে দেখছি চেয়ে, কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোর মশাল জ্বালিয়ে এল তাদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হই-চই, বাদ্যভাণ্ড, দৌড়োদৌড়ি, হুলুস্থূল ব্যাপার। সব দেখছি কল্পনায়। কাঁঠালতলায় যে জোনাকি জ্বলে সে জ্ঞান নেই।"[৪]

এই কল্পরাজ্যের রাজকুমারই যে বুড়ো আঙলার গল্প শোনাবেন আমাদের, ক্ষীরের পুতুলের কাহিনি নিজের মতো করে গড়ে দেবেন, নালকের মন-কেমন-করা বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেবেন, রাজকাহিনিতে শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের অনুপম গদ্য ইতিহাস গড়ে দেবেন, কল্পনার ডানায় ডানায় আঁকা তাঁর কথাছবি চিরকালের শিশুমনে জাগাবে বিস্ময় আর আনন্দ, তাতে আর সন্দেহ কী?

কিন্তু এই আনন্দের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাঁর জীবনে। জোড়াসাঁকো ছেড়ে তাঁরা সপরিবারে চলে গেলেন পলতায়। তাঁর বয়স তখন নয়-নয় করে হয়েছে সবে নয়। গুণেন্দ্রনাথ মনের মতো করে গঙ্গার ধারে বানিয়েছেন বাগানবাড়ি, সাজিয়েছেন সেই বাড়ি ব্রোঞ্জের ফোয়ারায়। বিরাট ঝিল খোঁড়া হয়েছে, সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে হাঁস। পাশেই হরিণের বাগান, হরিণের দল ছুটে বেড়াচ্ছে। ফুলের বাগান, ফলের বাগান আর অন্দরসজ্জার তো কথাই নেই। কিন্তু ছেলেবেলার সেই অফুরান খুশির মাঝেই ঘনিয়ে এল আঁধারকালো মেঘ। চলে গেলেন গুণেন্দ্রনাথ, মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে। দশ বছর বয়সেই ছেলেবেলাটা ফুরিয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথের। হারিয়ে গেল বিরাট এক ছায়া, বিশাল এক আশ্রয়।

আর্টের সহজ পথ

সে এক ভারি অসাধারণ ছবি। একটা জলাশয়, অনেক নিচে তার জল, মর্মর সোপানশ্রেণি ধাপে ধাপে নেমে গেছে গভীরে, সেই সোপানের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে নেমে আসছে কয়েকজন ইরানি, তুরানি স্নানার্থিনী। ছবিটা পড়েছিল অযত্নে, কাছারিখানায় ধুলোর মধ্যে। দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় খুঁজে পেয়ে ধুলো ঝেড়ে তাকে এনে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন। নিজের আঁকা সেই ছবি একদিন চোখে পড়তেই চমকে উঠলেন অবনীন্দ্রনাথ। কোথায় ছিল এ-ছবি? এই তো সেই ছবি যার দিকে তাকিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনি।

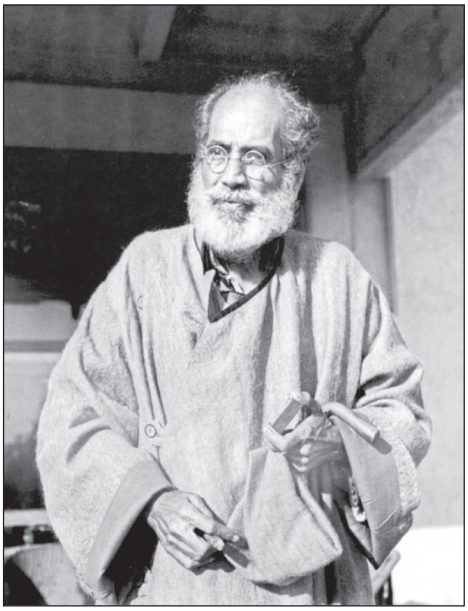

খামখেয়ালি সভায় সেই গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল শাহিবাগের অতীত স্মৃতি তাঁর মনে নতুন করে উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ তো সেই বিলিতি কায়দায় আঁকা, তেল রঙে, এসব ছবি তো জোড়াসাঁকোর লাইব্রেরি ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে সেই কবে! স্বদেশি যুগে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের এসব ছবি। ইউরোপীয় রীতির অনুশীলনেই ব্যস্ত তখন। শিক্ষানবিশির যুগ পেরিয়ে তখনও নিজের পথ খুঁজে পাননি তিনি, ঘুরে মরছেন বিদেশি ছবি নকলের গোলকধাঁধায়। তার মধ্যে মনের স্ফূর্তি নেই, নেই আনন্দ।

সেই পর্বে বিশিষ্ট শিল্পী পামার সাহেবের কাছে তিনি শিখেছিলেন অয়েল পেন্টিং, লাইফ স্টাডি (১৮৯৩-৯৫)। তার প্রভাব এইসব ছবির মধ্যে প্রকট। তার আগে অবশ্য সংস্কৃত কলেজে বন্ধু অনুকূলের কাছে প্রথম শিল্পশিক্ষার পর সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি দেখে, তাঁর 'মেজো মা' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর প্রতিভার সন্ধান পান। তাঁর নির্দেশে আর নিজের মায়ের অনুপ্রেরণায় আর্ট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ইতালিয়ান গিলার্ডি সাহেবের কাছে প্রথাগত ছবি আঁকা শিক্ষা—স্কেচ, প্যাস্টেল আর জল রঙের পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ (১৮৯২)। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পরীতির শিক্ষা সম্পূর্ণ করেও তিনি সরে এসেছিলেন সেই পথ থেকে যার প্রকাশ ঘটল তাঁর কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলিতেই (১৮৯৪-৯৬)। রাধাকৃষ্ণের এইসব ছবিতেই প্রথম পাওয়া গেল দেশজ ঐতিহ্যের প্রকাশ, খুঁজে পাওয়া গেল প্রকৃত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ছবির মধ্যে শুধু তাকিয়ে দেখার সৌন্দর্য নয়, তিনি খুঁজেছিলেন এক সামগ্রিক সৌন্দর্য—যে-রূপ অন্তরকে স্পর্শ করে, যা শুধু চোখকে নয়—আরাম দেয় মনকেও। আর মনের স্পর্শ না পেলে সব শিল্পচর্চাই যে বৃথা সে-বোধ তাঁর প্রথম জন্মেছিল গিলার্ডি সাহেবের বাড়িতে একটি দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার পর।

ওয়েলেসলি পার্কের কাছে ছিল গিলার্ডি

সাহেবের ভাড়াবাড়ি, যার একতলাতে থাকতেন আর-এক ইতালিয়ান মিউজিক মাস্টার মান্ধাটা। রোজ তাঁর মেয়ে পিয়ানো বাজায় আর তিনি বাজান বেহালা। সেই সুর শুনতে শুনতে চলে ছবি আঁকা শিক্ষা। একদিন আঁকতে আঁকতে অবনীন্দ্রনাথের মনে হল, আজ বেহালা যেন বাজছে না—কাঁদছে। কিছুতেই আঁকায় মন বসছে না তাঁর। এরকম তো আগে শোনেননি কোনওদিন, তাহলে? খোঁজ নিয়ে জানলেন মান্ধাটার মেয়ে আগের দিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। অবন ঠাকুর বলেছিলেন, ''বুঝেছিলুম সেদিন, মনে ধরল আজ সুরের আগুন। অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। মনের স্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, ছবি আঁকাও বৃথা, একথা জেনে নিলে মন।''[৫] এই জানাই তাঁর চিরকালের জানা, তাঁর আজীবনে শিল্পচর্চার মূল কথা।

এই অন্তরের বাজনাই তিনি শুনেছিলেন যখন তাঁর শিল্পচর্চার উৎসাহের খবর পেয়ে ছোট দাদামশাই নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদেশিনী বন্ধু মিসেস মার্টিনডেল তাঁকে বিদেশ পাঠালেন। অসামান্য ছবি সহ আইরিশ মেলোডির একটি বই তাঁর হাতে এল। সেই আইরিশ ইলুমিনেশন বদলে দিল তাঁর চিন্তাধারা। প্রতিমা দেবীর বাবা তাঁর ভগ্নীপতি শেষেন্দ্র দিলেন পার্শিয়ান ছবির বই। সেই ছবির সূক্ষ্ম কারুকার্য, অসামান্য উজ্জ্বলতা, রঙের পরিমিত ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করল। তাঁর যে-মন আটকে পড়েছিল পামার সাহেবের কাছে লাইফ স্টাডি, মডেল স্টাডির পাঁচিলে, তা খুঁজে পেল এক নতুন আকাশ। পটের ছবি জোগাড় করলেন, দেশজ ছবির আর যা যা নিদর্শন আছে সব এনে স্টাডি করতে শুরু করে দিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ''তখন সেই আইরিশ মেলডির ছবি দিল্লির ইন্দ্রসভার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিল। একদিকে আমার পুরাতন ইওরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর-এক দিকে এ দেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুইদিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই। সে যে আমার কি আনন্দ, ... যাক ভারতশিল্পের তো একটা উদ্দিশ পেলুম।''[৬]

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বৈষ্ণব পদাবলী শুনে, পড়ে এই সময়েই রাধাকৃষ্ণ সিরিজের ছবি আঁকা শুরু করলেন। জীবনের প্রান্তবেলায় অবনীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে বসে শিল্পী রেবতীভূষণ শুনেছিলেন সেই সময়ের কথা। বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে, মাসের পর মাস নিরামিষ ভোজন, বৈষ্ণবীয় আবেশ চারপাশে আর ছবি এঁকে চলেছেন তিনি। এ-ছবি তাঁর প্রাণের ছবি। যার মধ্যে আছে সেই 'মনের স্পর্শ'। এর পরেই আঁকছেন বুদ্ধচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতির ছবির সিরিজ। ভারতীয় চিত্রকলার এক নতুন পথ খুলে যাচ্ছে ছ-নম্বর বাড়ি থেকে। এক নতুন আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

কিন্তু এই আলোর মাঝেই হঠাৎ ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কলকাতায় দেখা দিল প্লেগ। রবিকাকার উদ্যোগে টাকা তোলা হল, খোলা হল প্লেগ হাসপাতাল। দেখলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় 'ইন্সপেকশনে' যাচ্ছেন সিস্টার নিবেদিতা। নিজেকে সে-উদ্যোগে সামিল করেননি তিনি, বসে বসে ছবি এঁকেছেন একা একা। কিন্তু হঠাৎ সব কিছুই থমকে গেল তাঁর, ন-দশ বছরের ফুলের মতো ছোট্ট মেয়ে শোভা চলে গেল প্লেগে। বড় আদরের মেয়েটিকে হারিয়ে তখন দিশেহারা অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে চলে গেলেন চৌরঙ্গীতে। মেয়ের শোক ভুলতে টিয়াপাখিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেইখানে থাকার সময় একদিন ডাক পড়ল তাঁর মেজোমার কাছ থেকে। তাঁর বাড়িতেই আলাপ হল আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ই বি হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে। হ্যাভেল সাহেব তাঁকে তাঁর কলেজের অধ্যাপক করতে চাইলেন। শোকে মুহ্যমান অবনীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন যে তাঁর পক্ষে সেই প্রস্তাব গ্রহণ অসম্ভব।

এগিয়ে এলেন হ্যাভেল। তাঁর দাদা, অভিভাবক এবং বন্ধু হয়ে বললেন, ''You do your work. Work is your only medicine.'' বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন ছবির জগতে। সান্ত্বনা দিলেন। গ্যালারি ঘুরে ঘুরে ছবি দেখালেন। ছবি দেখতে দেখতে, ছবি নিয়ে আলোচনা করতে করতে শোকের দাহ কিছুটা কমে এল। নতুন উদ্যমে অবনীন্দ্রনাথ আবার বসে পড়লেন ছবি আঁকতে। আঁকলেন শাহজাহানের মৃত্যুর প্রতীক্ষা ছবিটি। মেয়ের মৃত্যু যে-হতাশা, শোক আর যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছিল, সেইসব রং ঢেলে দিলেন ছবিতে।

বিশ শতকের গোড়ার সেই পর্বে ছবি আঁকার পাশাপাশি চলতে লাগল তাঁর ছবি আঁকা শিক্ষা দেওয়ার কাজ। এলেন তাঁর প্রথম ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারপর সত্যেন বটব্যাল। কিছুদিন পরে নন্দলাল বসু। সঙ্গে আবার তাঁর শ্বশুরমশাই! তিনি এসে বলে গেলেন, ''ছেলেটিকে আপনার হাতে দিলুম।'' শুরু হল ছবি আঁকার পাঠ। শৈশবের পণ্ডিতমশাই রজনী পণ্ডিত চাকরির খোঁজে এসেছিলেন তাঁর কাছে, তাঁকে দিলেন রামায়ণ, মহাভারত পড়বার কাজ। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি শুনতে শুনতে চলতে লাগল ছবি। সে-ছবি পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, যার মধ্যে শুধু রূপ নয়, আছে রস। যে-রসবস্তুর সন্ধান করেছিলেন প্রাচীন আলংকারিকরা, যা কাব্যশরীরের অতিরিক্ত, যা সহৃদয়হৃদয়সংবাদী, হৃদয়বান হৃদয়েই যার জন্ম সেই রসবস্তুর।

তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র তাই বলেছিলেন, ''ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হইনি। তারপর যখন ইংলন্ড এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরি এবং ধূপছায়ার (shade and light-এর) ছড়াছড়ি চলছে সেইসময় এই অনুকৃতির (naturalism-এর) মোহ কাটিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়, তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এইদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি।''[৭]

সৌন্দর্যের সন্ধান

ছবির মধ্যেও যে ভাব ও ভাবনার, হৃদয়গ্রাহিতার অনেকখানি আসন আছে, সে যে বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ নয়—সেকথা পাশ্চাত্যের বোদ্ধারা বোঝার আগেই বুঝেছিলেন আমাদের লোকশিল্পীরা, তাই তাঁরা পটের ছবিতে বা পাটনার কলমের কাজে সেই ভাবটিকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবকে যথাযথ প্রতিস্থাপনে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, ভাবকে ভাষা দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ। বিমূর্ত চিত্রকলার সাধনার নানা তাত্ত্বিক আলোচনা ইউরোপ যখন শুরু করেছে, ভারতবর্ষের লোকশিল্পীরা তার বহু শতাব্দী আগেই এই বিষয়ে তাঁদের চরম কথাটি বলে গেছেন। টেরাকোটার ঘোড়া কি প্রকৃত ঘোড়ার অনুকৃতি? তা তো নয়, কিন্তু বাঁকুড়ার শিল্পীরা ঘোড়ার চোখে মুখে লম্বা গলায় যে-তেজ ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা দুনিয়ায় নেই। এই তেজোদীপ্ত ভঙ্গিমাটি চোখ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়। আমাদের পট, ওড়িশার দারু ও কারুশিল্প, রাজপুতানার ছবি বা মোগল মিনিয়েচার, মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য সবেতেই উপলব্ধির ক্ষেত্রটি গুরুত্ব পেয়েছে। তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, দরকার শুধু অনুকরণ-সর্বস্ব আধুনিক মন ও মননের কাছে এই

উপেক্ষিত সত্যটি তুলে ধরবার। এই বোধ থেকেই জন্ম এক নতুন ঘরানার যার পোশাকি নাম ওরিয়েন্টাল আর্ট। অবনীন্দ্রনাথকে জসীমুদ্দিন একদিন প্রশ্ন করেছিলেন,

'' 'দাদামশাই... আপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর জন্মদাতা, আপনার মুখে একবার ভালো করে শুনি ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।'

''ছবিতে রং লাগাইতে লাগাইতে অবনবাবু বলেন, 'আমি জানিনে বাপু ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।'

''আমি বলি, 'তবে ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে লোকের এত লেখালেখি। সবাই বলে আপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর পথের দিশারী!'

''হাসিয়া অবনবাবু বলেন, 'তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে। আমি করেছি আমার আর্ট। আমি যা সুন্দর বলে জেনেছি, তা আমার মতো করে এঁকেছি।' ''

এই সুন্দরের সাধনাই অবনীন্দ্রনাথের সাধনা। তাঁর সমগ্র জীবনের মূল কথা। 'বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী'র 'সৌন্দর্যের সন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, ''... সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিস্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোনও কালে ছিল না, কোনও কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে।" এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বিশিষ্টতম। নকলনবিশি করে আর যাই হোক শিল্প হয় না। শিল্পীর মনের ভাবনাই সৌন্দর্যের সাজপোশাক, মুকুট পরে এসে হাজির হয়। যার যার মতো যেমন যেমন খুশি সেই সাজ।

একথা অনেকের জানা যে বিশ্বের শিল্পচর্চার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল ১৯০৭ সালে। হ্যাভেলের উৎসাহে, অবনীন্দ্রনাথের উদ্যমে ও নেতৃত্বে, কিচেনার কারমাইকেল, রোনাল্ডসে প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায়, সিস্টার নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট।' প্রাচ্য চিত্রচর্চার শিক্ষাকে প্রায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল আগেই অসুস্থ হয়ে হ্যাভেল দেশে ফিরে গেছেন, তার আগে অবনীন্দ্রনাথকে কলেজের উপাধ্যক্ষ করে গিয়েছেন তিনি (১৯০৫)। তিনি তো শুধু অভিভাবক ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থই অবনীন্দ্রনাথের আত্মজন। কথাপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, নন্দলাল বসুদের তিনি যেমন ভালবাসেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসা তিনি পেয়েছেন হ্যাভেলের থেকে। সেইসময় আর্ট কলেজের দায়িত্ব অবনীন্দ্রনাথের ওপর ন্যস্ত। একদিকে কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষের (১৯০৬-১৫) দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, তারই মধ্যে সোসাইটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন। আবার শিল্পশিক্ষা দিচ্ছেন জোরকদমে, নিজে ছবিও আঁকছেন, স্বদেশি ভাবনার স্রোত নতুন গতি পাচ্ছে তাঁর শিল্পদর্শনে। এইসময় বাংলার বিদগ্ধসমাজে অবনীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা ছিল অপরিসীম। তার একটা প্রমাণ মেলে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় ১৯১০ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় কলমে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু মতান্তরের কারণে তিনি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে ইস্তফা দেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হয়। হিন্দু পেট্রিয়টে লেখা হয়—

''The entire Bengalee community appeals to the patriotism of Mr. Abanindranath Tagore, C.I.E. to withdraw his resignation of the post of vice principal of the Government School of Art. Without him the institution will be like the play of 'Hamlet' with the part of Danish Prince left out. We appeal to Lord

Charmichael to play the blessed role of a peace-maker which is so congenial to His Excellency's temperament. The retirement of Mr. Tagore from the School of Art will spell disaster for the cause of Indian Art."[৮]

এমনকী ১৯১৫ সালে যখন পদত্যাগ করলেন তিনি, তখনও রাজনীতিবিদ ও পরবর্তী কালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনকে হাউস অফ কমন্স-এ দাঁড়িয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। যদিও সে-ব্যাখ্যায় ধুরন্ধর রাজনীতিক চেম্বারলেন সুকৌশলে বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করেছিলেন।

ভারতীয় শিল্পের মাহাত্ম্য শুধু নয়, সমগ্র প্রাচ্য কলাচর্চার এক যুগান্তর ঘটেছিল বিশ শতকের প্রথম দেড় দশকে। এইসময় দ্বিতীয়বারের জন্য অসুস্থ শরীরে ভারতে এলেন জাপানি চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রবাদপুরুষ ওকাকুরা। অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে পুরীতে জগন্নাথদর্শনে আপ্লুত হলেন তিনি, ভারতীয় শিল্পের পবিত্র স্নিগ্ধতা মুগ্ধ করল তাঁকে। কোণার্ক মন্দিরের স্থাপত্যে বিস্মিত হলেন। দেশে গিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আরও দুই অসামান্য শিল্পী টাইক্কান, হিশিদাকে। জাপানের শিল্পশৈলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল ভারতীয় শিল্পকলার। দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন রীতি। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ও শিষ্যরা—অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, মুকুল দে, কে বেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুমারস্বামী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে ভারতীয় শিল্প-আদর্শকে নিয়ে গেলেন এক অন্য উচ্চতায়। অবনীন্দ্রনাথের দেখানো পথে তা সম্ভব হলেও, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবনা ও রীতির প্রকাশ ঘটালেন। আসলে শুধু চিত্রচর্চা নয়, ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে ভাব-ভাবনার ক্ষেত্রটিও গড়ে দিচ্ছিলেন তিনি। সৈয়দ মুজতবা আলি যথার্থই বলেছিলেন, ''আজ যে ভারতবর্ষের সুদূরতম প্রান্তে ভারতীয় শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিবার 'ভাষা' পাইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অবনীন্দ্রনাথের কি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অবিচল নিষ্ঠা ছিল সেকথা কয়জন শিল্পী শিল্পীরসিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কিম্বা সশ্রদ্ধ স্মরণ করে?"[৯]

জাতীয়তাবোধের স্রোত সেইসময় দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা কিছু স্বদেশের তার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত এবং যুগপ্রতিবেশজাত আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথের দেশজ ঐতিহ্য সমন্বিত শিল্পভাবনা সেই উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়তা পেল। বঙ্গভঙ্গের বহু আগে থেকেই তিনি শিল্পরচনায় দেশজ ঐতিহ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বাঙালি যখন এককাট্টা হল, বিলিতি বর্জনের নেশায় আচ্ছন্ন হল, নতুন এক আদর্শ খুঁজল, খুঁজল নতুন নেতা নতুন পতাকা, সেইসময় গৈরিকবেশী চতুর্ভুজা ভারতমাতার আত্মপ্রকাশ ঘটল অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে। হাতে অন্নবস্ত্রবিদ্যা আর বরাভয়। দেশবাসীর মনে সেই মূর্তি জাগিয়ে তুলল নতুন প্রেরণা আর উদ্দীপনা। বাঙালির মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হল। উচ্ছ্বসিত ভগিনী নিবেদিতা লিখলেন, ''From beginning to end the picture is an appeal, in the Indian Language, to the Indian heart. It is the first great masterpiece in a new style. I would reprint it, if I could, by tens of thousands, and scatter it broadcast over the land, till there was not a peasant's cottage, or a cradtman's hut, between Kedar Nath and Cape Comorin, that had not this presentment of Bharat-Mata somewhere on its walls... Up to this time Mr. Tagore has been mastering his lan-

guage, creating his style. Now, he has begun to write poems. May he never cease!"[১০]

সেই স্বদেশি যুগে পোশাক, রুচি, চিন্তা-চেতনা সর্বত্রই একটা আবেগ কাজ করছিল; নাটক, কাব্য, গান সর্বত্রই নতুন আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছিল; রবীন্দ্রনাথ গান লিখছেন, রাখি পরাতে ছুটছেন নাখোদা মসজিদের ভেতরে। সম্প্রীতির ঢেউ আছড়ে পড়ছে, চরকাকাটা চলছে বাড়িতে বাড়িতে। আর বিলিতি রীতি ছেড়ে ভারতীয় শিল্প পাচ্ছে এক নতুন প্রতিষ্ঠাভূমি, নতুন পরিচয়। আর এই পরিবর্তনের নেপথ্যে যাঁর অবদান সর্বাগ্রে মান্য তিনি অবনীন্দ্রনাথ। নিজের শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুধু নয়, শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে এক নতুন আকাশের সন্ধান দিচ্ছেন তিনি বাঙালিকে আর প্রতিটি ভারতবাসীকে।

শিল্পগুরু তিনি, অভিনব ছিল তাঁর শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতি। তিনি হাতে ধরে ছবি আঁকা বা রং করবার কায়দাকানুন শেখাতেন না, আলোচনা করতেন ছবির ভাব আর বিষয় নিয়ে। ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে থাকতেন, দেখতেন কীভাবে 'ছবি লেখেন' তিনি, দ্বিমাত্রিক ছবিতে প্রাণসঞ্চার করেন। কোথায় কতখানি রঙের ব্যবহার ছবির ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়, দেখতে দেখতে ভাবেন আর ভাবতে ভাবতে শেখেন। উদ্বুদ্ধ হন সকলে, লাভ করেন অনুপ্রেরণা। অবনীন্দ্রনাথ চাইতেন তাঁর ছাত্ররা যেন স্বকীয় রীতিতে ছবি আঁকতে শেখেন, প্রত্যেকে নিজের আলাদা স্টাইল তৈরি করতে পারেন, নিজের সৌন্দর্য উপলব্ধিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি মানতেন, বৈচিত্র্য না থাকলে সৃষ্টির জগতে শুধুই শূন্যতা, শুধুই হাহাকার, সেখানে আনন্দ নেই। আর যেখানে আনন্দ নেই সেখানে সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই একই গুরুর শিষ্য হয়েও, আদর্শগত ঐক্য থাকলেও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা আলাদা হয়ে গেলেন। নন্দলাল বসুর ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠল শিব-পার্বতী আর পৌরাণিক দেবদেবী, ক্ষিতীন্দ্রনাথের হাতে চৈতন্যজীবন, অসিতকুমার হালদারের তুলি থেকে স্নিগ্ধতায় অপরূপ বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্দু পুরাণনির্ভর ছবি।

নন্দলাল বসু তাই লিখেছেন, ''অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা পারিনি। কিন্তু আমরা যা পেলুম, সে হল—নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হল না; সে-ধারা মোগল পদ্ধতি নয়, পার্শিয়ান পদ্ধতিও নয়। অজন্তা, রাজপুত, আর দেশি পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারা—আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।"[১১] *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

১। রাণী চন্দ, *জোড়াসাঁকোর ধারে* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ: ১৩৯৮), পৃঃ ১০, ১৩

২। তদেব

৩। রাণী চন্দ, *ঘরোয়া*, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ: ১৩৯৮), পৃঃ ১৯

৪। *জোড়াসাঁকোর ধারে*, পৃঃ ৩৪-৩৫

৫। তদেব পৃঃ ৯০

৬। তদেব পৃঃ ১৫৭-৫৮

৭। *পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা*, পৃঃ ৩২

৮। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ*, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স: ১৩৮৫), পৃঃ ৮৯

৯। *পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা*, পৃঃ ৫৬

১০। Centenary Souvenir, Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, p. 113

১১। *পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা*, পৃঃ ২৬